বিবর্তনের বই, বিজ্ঞানচেতনার বই

সাজিদ রাজ্‌জাক

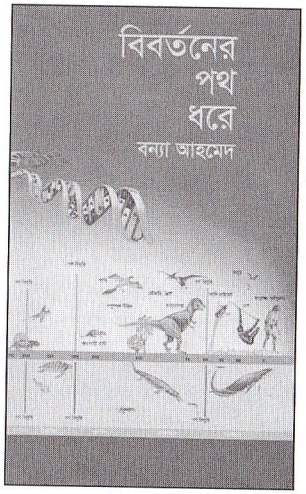

বিবর্তনের পথ ধরে
বন্যা আহমেদ
প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা
ফেব্রুয়ারি ২০০৭
২৪৮ পৃষ্ঠা
৩৫০.০০ টাকা

বাংলাদেশের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনেক বিজ্ঞান শিক্ষক তাঁদের শিক্ষার্থীদের এ-রকম সতর্কবার্তা দিতেও ভোলেন না যে বিবর্তনবাদ পড়া গেলেও বিশ্বাস করা যাবে না। এই অবস্থাটি শুধু যে তৃতীয় বিশ্বের এই দেশেরই তা নয়; যখন জানা যায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্বঘোষিত সূতিকাগার খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই বিবর্তনবাদের বিপরীতে সৃষ্টিতত্ত্বকে প্রতিষ্ঠার জোর চেষ্টা চলে তখন তা আমাদের মনে আতঙ্ক উদ্রেক না করে পারে না। কারণ বিবর্তনবাদ বৈজ্ঞানিক তত্ত্বমাত্র নয়। এটি প্রগতিশীল ও বৈজ্ঞানিকভাবে সচেতন সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য অপরিহার্য বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি।

বন্যা আহমেদ রচিত *বিবর্তনের পথ ধরে* বইটি পড়তে পড়তে বিবর্তনবাদ এবং আনুষঙ্গিক এমন অনেক প্রসঙ্গের মুখোমুখি আমরা হব যে-সব এড়িয়ে জগত ও জীবনের সারসত্যের দেখা পাওয়া অসম্ভব। লেখক তাঁর 'কিছু কৈফিয়ত ও কৃতজ্ঞতা'য় বলেছেন,

> [...] আমরা যতই নিজেদেরকে তথাকথিত 'সৃষ্টির কেন্দ্রস্থলে বসিয়ে সান্ত্বনা না পাওয়ার চেষ্টা করি না কেন, মানুষ আসলে অন্যান্য জীবের মতোই বিবর্তনের অমসৃণ আর বন্ধুর পথেরই সহযাত্রী। (পৃ. ৫)

হ্যাঁ, বিবর্তনের অমসৃণ আর বন্ধুর পথকে খুব সহজে আমাদের দরবারে হাজিরের চেষ্টা করেছেন তিনি। তাঁকে ধন্যবাদ।

বাংলা ভাষায় উচ্চতর জ্ঞানচর্চার ইতিহাস খুব বেশিদিনের নয়। তার উপর বিজ্ঞান বিষয়ক লেখাপত্র তো আরো হাতে গোনা। আর বিজ্ঞানকেন্দ্রী বইপত্রগুলো সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একান্ত কৌতূহলী ভিন্ন সাধারণ্যের আগ্রহ উৎপাদনে ব্যর্থ। কারণ এ-সব লেখার উপস্থাপনভঙ্গি থেকে শুরু করে ভাষারীতিতে বিপুল পাঠককে অংশী করার কোন প্রয়াস প্রায়শই চোখে পড়ে না। বিপুল পাঠকের কথা বলছি এজন্যে যে বিজ্ঞান নিজেই বিপুল মানুষের প্রয়োজন পূরণের জ্ঞানবিশেষ।

বাংলায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর *বিশ্ব পরিচয়* বইয়ের মধ্য দিয়ে বিজ্ঞানসাহিত্যের একটি মাত্রা সূচনা করেন। আমরা অবশ্য এ-ও ভুলে যাই নি যে, কবি রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের সেরেস্তাদার জগদানন্দ রায়কে দিয়েছিলেন হ্যালির ধূমকেতু

বন্যা আহমেদ

বাংলা ভাষায় উচ্চতর জ্ঞানচর্চার ইতিহাস খুব বেশিদিনের নয়। তার উপর বিজ্ঞান বিষয়ক লেখাপত্র তো আরো হাতে গোনা। আর বিজ্ঞানকেন্দ্রী বইপত্রগুলো সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একান্ত কৌতূহলী ভিন্ন সাধারণ্যের আগ্রহ উৎপাদনে ব্যর্থ। কারণ এ-সব লেখার উপস্থাপনভঙ্গি থেকে শুরু করে ভাষারীতিতে বিপুল পাঠককে অংশী করার কোনো প্রয়াস প্রায়শই চোখে পড়ে না।

পর্যবেক্ষণের ভার। এ তথ্য আমাদের এমন সিদ্ধান্তে পৌছতে নির্দ্বিধ করে যে রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানচর্চা নেহায়েত শখের বিষয় ছিল না বরং তা ছিল তাঁর বৈজ্ঞানিক চেতনাগত প্রাগ্রসরতার পরিচয়বহ যে চেতনার ভিত্তিভূম নিশ্চিতভাবেই সেই বিজ্ঞানবোধ। পরবর্তীকালে আমাদের দেশে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চাকে নানাভাবে এগিয়ে নিয়ে গেছেন বেশ কয়েকজন লেখক-গবেষক। এঁদের মধ্যে নাম উল্লেখ করা যায় যাঁদের তাঁরা হলেন – জুহুরুল হক, আবদুল জব্বার, এম হারুনর রশীদ, আবদুল্লাহ আল মুতী, আবদুল হক খন্দকার, দ্বিজেন শর্মা, আলী আসগর, মুহম্মদ ইব্রাহীম, সুব্রত বড়ুয়া প্রমুখ।

বন্যা আহমেদ-এর আলোচ্য বইটি বাংলাদেশের বিজ্ঞান সাহিত্যে সাম্প্রতিকতর সংযোজন। এ বইয়ের কেন্দ্রীয় গুরুত্বের জায়গাটি হচ্ছে এই যে, এখানে বিজ্ঞানের এক প্রাণ-ভোমর 'বিবর্তনবাদ'কে শুষ্ক তথ্য উপাত্তের ঘেরাটোপ থেকে বের করে যুক্তিসিদ্ধ সজীব

বিশ্লেষণের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। লেখকের লক্ষ্য বিজ্ঞানের কাঠামোগত যান্ত্রিক চেহারা নয়, মানবিক অবয়ব প্রদর্শন।

২.

বন্যা আহমেদ *বিবর্তনের পথ ধরে* বইটিকে এগারটি অধ্যায়ে ভাগ করেছেন। যেমন – এলাম আমরা কোথা থেকে? বিবর্তনের প্রাণের স্পন্দন, অনন্ত সময়ের উপহার, চোখের সামনেই ঘটছে বিবর্তন! ফসিল এবং প্রাচীন উপাখ্যানগুলো, ফসিলগুলো কোথা থেকে এল, এই প্রাণের মেলা কত পুরোনো? মিসিং লিঙ্কগুলো আর মিসিং নেই, আমাদের গল্প, ইন্টিলিজেন্ট ডিজাইনিং, সৃষ্টিতত্ত্বের বিবর্তন, যে গল্পের শেষ নেই, পরিশিষ্ট হিসেবে যুক্ত হয়েছে 'বিবর্তন সম্পর্কে প্রচলিত ভুল ধারণাগুলো' শীর্ষক একটি সাধারণ আলোচনা। বইশেষে বৈজ্ঞানিক প্রপঞ্চগুলোর বাংলা পরিভাষা সংযোজন পাঠকের জন্য বাড়তি পাওয়া।

বন্যা আহমেদ আড়াইশ পৃষ্ঠার এ বইয়ে প্রাণের উদ্ভবের পর থেকে এ পৃথিবীতে জীবনের বিকাশ ও বিবর্তনের স্বরূপ উদঘাটনের চেষ্টা করেছেন। মানুষ নামের বুদ্ধিমান-সচেতন প্রজাতির ক্রম উত্তরণের বিষয়টিও এ বইয়ের অন্যতম আলোচ্যবিন্দু। আর প্রাসঙ্গিক বিষয়আশয় হিসেবে অনুপস্থিত থাকেনি – মহাদেশীয় সঞ্চরণ, ল্যামার্কীয় ভ্রান্ত ধারণা, ডারউইনের সমুদ্রযাত্রা, গ্যালাপ্যাগাস দ্বীপের পাখি, পৌরাণিক দৈত্য সাইক্লোপস, বিশালবপু তিমিমাছদের ডাঙা থেকে পানিতে ফিরে যাওয়া, ডিএনএর রহস্যাভেদ, ফ্লোরস দ্বীপের বেঁটে বাটুল, কিংবা ডানাওয়ালা ডাইনোসরের ফসিল সংক্রান্ত ব্যাপার-স্যাপার। আর এ বইয়ের সবচেয়ে তাৎপর্যের দিক হচ্ছে পাশ্চাত্য দুনিয়ায় হালে জমে ওঠা বিবর্তনবাদ বিরোধী সৃষ্টিতত্ত্বের অপতৎপরতার নমুনা উপস্থাপন। দেড়শ বছর আগে প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে জীবজগতে বিবর্তনের যে অনুকম্পা চার্লস ডারউইন দাঁড় করিয়েছিলেন, যে বিবর্তনবাদ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষানিরীক্ষাসিদ্ধ, যে বিবর্তনবাদ জীবনের বিকাশের ক্ষেত্রে প্রচলিত সব আজগুবি তত্ত্বকে ধূলিস্যাৎ করে দেয় সে-ই বিবর্তনবাদকে লেখক দরদের সঙ্গে পাঠকবোধ্য করবার প্রয়াস পেয়েছেন। সাবলীল ভাষা, নিজস্বতা-চিহ্নিত যৌক্তিক বিশ্লেষণ আর প্রয়োজনীয় তথ্যমালার যথানুগ সমাবেশ আলোচ্য বইটিকে মূল্যমণ্ডিত করেছে। বইয়ের শুরুতেই লেখক প্রখ্যাত জীববিজ্ঞানী ও বংশগতিবিদ থিওডসিয়াস ডবঝানস্কি (১৯০০-১৯৭৫)র যে কথাটি উদ্ধৃত করেছেন তার আলোকেই ব্যাখ্যা করা যায় গোটা বইয়ের বক্তব্যকে। বলা হয়েছে 'বিবর্তনের আলোকে না দেখলে জীববিজ্ঞানের কোনো কিছুরই আর অর্থ থাকে না'। অথচ আমরা দেখতে পাচ্ছি বিবর্তনবাদকে সম্পূর্ণ পাশ কাটিয়ে জগত ও জীবনকে ব্যাখ্যার মধ্যযুগীয় সব রূপকলা। বিবর্তনবাদের শত্রু বিশ্বব্যাপ্ত। আমেরিকা থেকে তুরস্ক – সর্বত্র। বন্যা আহমেদের লেখা থেকে উদ্ধৃত করি–

> বিবর্তনবিরোধীরা ডারউইনিজমকে শুধু প্রত্যাখ্যান করেই ক্ষান্ত হননি, সমস্ত 'শয়তানের চাবিকাঠি' হিসেবে চিহ্নিত করতেও চেয়েছে। আমেরিকার রক্ষণশীল অংশের মদদপুষ্ট

> ডিসকভারি ইনস্টিটিউটর পুরোধা ব্যক্তিত্ব এবং ইন্টিলিজেন্ট ডিজইনের অন্যতম প্রবক্তা ফিলিপ জনসনের মতে, যেহেতু ডারউইনের মতানুসারে মানুষ মনে করে মানুষ বানর থেকে উদ্ভূত হয়েছে, সেহেতু তারা যে কোনো ধরনের 'নাফরমানি' করতে পারে – সমকামিতা, গর্ভপাত, পর্ণোগ্রাফি, তালাক, গণহত্যা সবকিছু! এমন একটা ভাব, ডারউইন আসার আগ পর্যন্ত সারা পৃথিবী যেন এগুলো থেকে একেবারেই মুক্ত ছিল। 'আনসারিং জেনেসিস' নামে একটা মৌলবাদী খ্রিস্টান ওয়েবসাইটে আছে, যারা এখনো মনে করে পৃথিবীর বয়স ছয় হাজার বছরের বেশি না। ওয়েবসাইটের উদ্দেশ্যেই হচ্ছে যে কোনো উপায়ে বিবর্তনকে ঠেকানো আর 'প্রমাণ করা' বিজ্ঞান যাই বলুক না কেন, বাইবেলে যা লেখা আছে তাই ঠিক, তারা সুন্দর করে চার্ট বানিয়ে দেখিয়েছে বিবর্তন মানালে পাওয়া যাবে রেসিজম, প্যাসিজম, কমিউনিজম, ল্যাজিজম, আর জেনেসিস মানলে এ পৃথিবীতে থাকবে প্রেম, ভালবাসা, স্নেহ, মায়া আর মমতা! একই তালে তাল ঠুকে ওদিকে হারুন ইয়াহিয়ার মতো ব্যক্তিরা আবার দিব্যি বলে বেড়াচ্ছেন যে, বিবর্তনবাদ পশ্চিমা-আধিপত্যবাদী শক্তির দ্বারা সৃষ্ট এক ধরনের প্রতারণা ছাড়া নাকি আর কিছুই নয়! (পৃষ্ঠা-১৭১)

এ দীর্ঘ উদ্ধৃতি থেকে লেখকের যুক্তি, তথ্যসঞ্চালন, রসবোধ, ভাষিক প্রাঞ্জলতার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। *বিবর্তনের পথ ধরে* বইয়ের প্রায় প্রতিটি কোণেই এ দৃশ্য সুলভ্য। আর জানা ইতিহাসের গহীনে আরো অজানা ইতিহাস যেন খুঁড়ে বের করে আনেন লেখক। যেমন বইয়ের শুরুতেই আমরা এ তথ্য পেয়ে চমকে ওঠি যে ১৮৩১ সালে ডারউইনের বিশাল জাহাজে করে বিশ্বভ্রমণের ভেতরেই লুকিয়ে ছিল বিবর্তনবাদের ইতিহাস, বিশ্বভ্রমণের সূত্রে ভূ-প্রকৃতির সাথে বিচিত্র সব জীবের সমারোহ দেখতে দেখতে একদিন এক প্রবল ভূমিকম্প ডারউইনকে নিক্ষেপ করল গভীর অনুসন্ধিৎসায়। দেখলেন উপকূলের ভূমির উচ্চতা ৮ ফুট বেড়ে গেছে। এর মধ্যে থেকেই ডারউইন এই সত্যের কাছে পৌছান যে আদিকাল থেকে প্রাকৃতিক শক্তিগুলোই পরিবর্তন করে আসছে পৃথিবীর চেহারা। ভূ-প্রকৃতির স্থিতিশীলতার বিপরীতে সদা-পরিবর্তনশীলতার তত্ত্বটিই পরবর্তীতে ফসিলবিদদের আবিষ্কৃত প্রাণী ও উদ্ভিদের ফসিল – এই তত্ত্ব তাঁকে প্রাণের বিবর্তন সম্পর্কে সিদ্ধান্তে আসতে প্ররোচিত করে। ডারউইন তাঁর আবিষ্কৃত বিবর্তনবাদকে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠা করলেন ২০ বছরের পরীক্ষা-নিরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ এবং বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের ফলাফল হিসেবে। ১৮৫৯ সালে তাঁর কাছ থেকে আমরা পেলাম সেই ঐতিহাসিক পুস্তক *On the origin of species by means of natural selection* বা *প্রজাতির উৎপত্তি*– এ বই শুধু বিবর্তনবাদের উদ্ভবের ইতিহাসই নয় বরং ফসিল রেকর্ড নিয়ে প্রামাণ্য বক্তব্য হাজিরেও এর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এ বিষয়ে লেখকের সুমিতকথন–

> পৃথিবীর দীর্ঘ সাড়ে তিনশ কোটি বছরের প্রাণের ইতিহাসের সরাসরি সাক্ষী এই ফসিলগুলো, তারা ধারণ করে রেখেছে এই গ্রহে প্রাণের অফুরন্ত কোলাহলের পদচিহ্ন। (পৃ-৮১)

লেখক যেমন আমাদের আদি পূর্বপুরুষের সন্ধানে বেরিয়েছেন ঠিক তেমনি ফসিল রেকর্ড করে এ যুগান্তকারী সিদ্ধান্তে পৌছাতে সক্ষম হয়েছেন যে প্রথম দিকে বেশ

কিছুকাল মানুষের আদি পূর্বপুরুষ H.erectus আফ্রিকার আশেপাশে গরম অঞ্চলগুলোতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। তারপর এশিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে তারা পরিব্যাপ্ত হয়। এখন সভ্যতার দায় চাপায় আফ্রিকার উপর, অথচ এই বই আমাদের সামনে জাজ্বল্য করে তুলছে আফ্রিকায় বিশ্বমানবের প্রাথমিক পদচারণার ঐতিহাসিক সত্যকে।

বন্যা আহমেদ তাঁর বইয়ে একটি চাঞ্চল্যকর বিষয়ের অবতারণা করেছেন। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী নীতি যেমন অন্যায় রক্ত ঝরায় তেমনি তাদের প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তাপ্রকাশ বিজ্ঞানকে পর্যন্ত টেনে অন্ধকার কুঠুরিতে বন্দী করতে চায়। ইন্টিলিজেন্ট ডিজাইন (আইডি) র মোড়কে বিবর্তনতত্ত্বের বিরুদ্ধে সৃষ্টিতত্ত্বকে দাঁড় করানোর মার্কিন রাষ্ট্রীয় চেষ্টার স্বরূপ লেখক উন্মোচন করেছেন। রক্ষণশীল চক্র সেখানে পাঠ্যসূচি থেকে বিবর্তন সংক্রান্ত পাঠ বন্ধের দাবি তুলেছে। বিবর্তনসংক্রান্ত গবেষণার জন্য অর্থবরাদ্দ কমিয়ে দেবার চেষ্টায় লিপ্ত তারা। অন্যদিকে আবার পোপ জন পলের মতো কেউ কেউ বিশ্বাসী বিবর্তনের নামে গোঁজামিলের নানান তত্ত্ব ফাঁদছেন।

বিবর্তনবাদ বিরোধীরা নানান অবয়বে সবসময়ই সক্রিয় ছিল। এরা আধুনিকতা ও মানবিকতার শত্রুপক্ষ। বন্যা আহমেদ আবেগের বশবর্তী না হয়ে যুক্তির আলোয় বিবর্তনবাদের ইতিহাস বর্ণণাও এর যৌক্তিকতা প্রাসঙ্গিকতা উপস্থাপন করেছেন। বইয়ের অন্তিমে তিনি যে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন তার উত্তর-অন্বেষণ আমাদের সবার জন্যই জরুরি :

> আপনি আপনার চারপাশের সবকিছুকে অনড়, স্থির এবং অপরিবর্তনীয় হিসেবে দেখবেন নাকি তার সদা গতিময় বিবর্তনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন সেটাই এখন বিবেচ্য বিষয়। (পৃ. ২১৪)